হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
প্রফেসর সুনীত কুমার ভদ্র
ড. অসীম সরকার

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

চিত্রাঙ্কন
কান্তিদেব অধিকারী

গ্রাফিক্স
বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, ধর্মশিক্ষা দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নৈতিক গুণাবলি অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি	১–৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেব-দেবী ও পূজা	৫–১০
তৃতীয় অধ্যায়	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী এবং ধর্মগ্রন্থ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	১১–১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ধর্মগ্রন্থ	১৮–২৩
চতুর্থ অধ্যায়	সহমর্মিতা	২৪–২৯
পঞ্চম অধ্যায়	নম্রতা, ভদ্রতা ও অগ্রাধিকার	৩০–৩৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	সততা ও সত্যবাদিতা	
প্রথম পরিচ্ছেদ	সততা	৩৬–৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সত্যবাদিতা	৪০–৪৩
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন	৪৪–৪৮
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	৪৯–৫২
নবম অধ্যায়	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	৫৩–৫৮

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

খুব সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীতে রয়েছে অসংখ্য গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ। পৃথিবীতে রয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব–মানুষ। পৃথিবীর কোথাও রয়েছে গভীর বন, কোথাও উঁচু পাহাড়-পর্বত, কোথাও নদ-নদী, কোথাও সাগর-মহাসাগর। কোথাও রয়েছে সমতলভূমি, আবার কোথাও ধু-ধু মরুভূমি। গাছে-গাছে ফুল-ফল, ডালে-ডালে পাখি, আর পাখির কল-কাকলি। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ। আকাশের কোনো সীমা নেই। আকাশে রয়েছে চন্দ্র-সূর্য, অনেক গ্রহ-উপগ্রহ। আরও রয়েছে অগণিত নক্ষত্র।

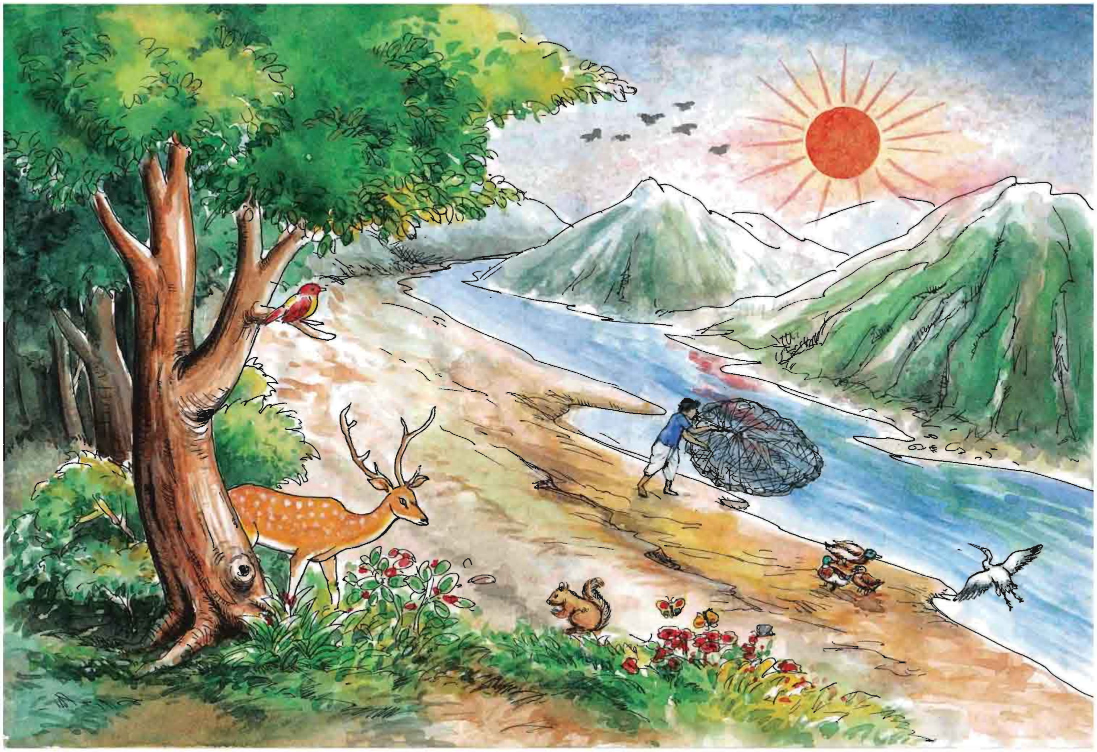

নিসর্গ দৃশ্য

নিসর্গ দৃশ্যটি দেখি এবং সেখানে যে-সকল বস্তু দেখতে পাচ্ছি তা থেকে পাঁচটি বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করি :

বস্তুর নাম
১।
২।
৩।
৪।
৫।

পৃথিবীর কোনো কিছুই হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি। সবকিছুরই একজন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। যেমন কাঠমিস্ত্রি তৈরি করেন চেয়ার-টেবিল, রাজমিস্ত্রি তৈরি করেন দালান-কোঠা। তেমনি চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষ, অন্যান্য জীব ও জগতের সকল কিছুর একজন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। এ স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তার নাম কী? তাঁর অনেক নাম। তাঁকে কেউ বলে ঈশ্বর। কেই বলে গড। কেউ বলে আল্লাহ। যেমন একই জলকে কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে পানি।

হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে বলে ঈশ্বর। ভগবানও তাঁর একটি নাম। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর বাইরেও যা কিছু আছে তার স্রষ্টাও ঈশ্বর। মূলকথা সবকিছুর স্রষ্টাই ঈশ্বর।

ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। এ সম্পর্ক হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক। ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব তাঁর সৃষ্টি। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন। এজন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাঁকে ভক্তি করব। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের থাকতে হবে গভীর বিশ্বাস।

ঈশ্বর জীবের অন্তরেও অবস্থান করেন। তাই সকল জীবকে আমরা ঈশ্বর বলে মনে করব এবং সকল জীবকে ভালোবাসব। ভালোবাসব ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। কারণ ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের মঙ্গল করবেন।

সুতরাং ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। এ নৈতিক শিক্ষাটি আমরা সব সময় মনে রাখব এবং সকল কাজে তা মেনে চলব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। রাতে ______ অগণিত নক্ষত্র দেখা যায়।
২। ঈশ্বর ______ সৃষ্টি করেছেন।
৩। বিচিত্র রূপ আমাদের এই ______ ।
৪। সকল ______ মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।
৫। জীবকে ভালোবাসাই ______ ভালোবাসা।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ডালে-ডালে	আমরা তাঁকে ভক্তি করব।
২। ভগবানও	বন্ধুকে ভালোবাসা।
৩। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য	ঈশ্বরকে ভালোবাসা।
৪। ঈশ্বর আমাদের	তাঁর একটি নাম।
৫। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসাই	পাখি।
	সৃষ্টি করেছেন।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। আকাশে কী রয়েছে ?

ক. চন্দ্র　　খ. সাগর
গ. গাছ　　ঘ. নদী

২। কাঠমিস্ত্রি কী তৈরি করেন ?

ক. জামা　　খ. গহনা
গ. চেয়ার　　ঘ. দালান

৩। যিনি দালান তৈরি করেন তাঁকে কী বলে ?

ক. কাঠমিস্ত্রি　　খ. রাজমিস্ত্রি
গ. কামার　　ঘ. তাঁতি

২০১৫

৪। হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে কী বলে ?

ক. খোদা　　খ. ঈশ্বর

গ. গড　　ঘ. আল্লাহ

৫। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ?

ক. মধুর　　খ. সুন্দর

গ. চমৎকার　　ঘ. নিবিড়

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আমাদের এই পৃথিবী কেমন ?
২। সৃষ্টির সেরা জীব কে ?
৩। কে আমাদের প্রতিপালন করছেন ?
৪। ঈশ্বর কোথায় অবস্থান করেন ?
৫। আমরা কাকে ভালোবাসব ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা – ব্যাখ্যা কর।
২। ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কেন ?
৩। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা বর্ণনা কর।
৪। কীভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি করবে ?
৫। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে কী হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের কোনো আকার নেই। তিনি নিরাকার। তবে তিনি যে-কোনো আকার বা রূপ ধারণ করতে পারেন।

অসীম তাঁর ক্ষমতা। অশেষ তাঁর গুণ। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা আকার পেলে তাঁকে দেবতা বলে। দেবতা বা দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। দেব-দেবী অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ অনেক কিছু করতে পারে না। কিন্তু দেব-দেবীরা সবকিছু করতে পারেন। দেব-দেবীদের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। দেব-দেবীর কথা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে আছে।

দেব-দেবী অনেক। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি। ঈশ্বর যে-দেবতারূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। যে-দেবতারূপে তিনি পালন করেন, তাঁর নাম বিষ্ণু। যে-দেবতারূপে তিনি ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব।

আমরা দেব-দেবীর পূজা করি। পূজা করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। দেবতারা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। আমাদের মঙ্গল হয়। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়।

তাহলে পূজা কী? পূজা হলো দেব-দেবীর আরাধনা, অর্চনা বা উপাসনা। ফুল-ফল, জল নানা উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করা হয়। দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরি করে পূজা করা হয়। পূজার সময় পবিত্র মনে দেবতার মন্ত্র পাঠ করতে হয়। পূজা শেষে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়।

দেব-দেবীর প্রতিমা মন্দিরে বা গৃহে থাকে। দেব-দেবীর প্রতিমা দেখলে প্রণাম করতে হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা বিভিন্ন সময়ে করা হয়।

এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গণেশের পরিচয় দেওয়া হলো :

২০১৯

দেবী লক্ষ্মী

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। তাঁর বর্ণ গৌর। লক্ষ্মী পদ্মাসনা। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। লক্ষ্মীর ডান হাতে পদ্মফুল, বাম হাতে শস্যের ছড়া। ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীর আসন আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। লক্ষ্মীপূজা করলে আমাদের ধন-সম্পদ লাভ হয়। দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত শান্ত ও সুন্দর। তিনি দীন-দরিদ্রের দুঃখ দূর করেন। তিনি মানুষের উপকার করেন। আমরা লক্ষ্মীপূজা করব এবং তাঁর মতো শান্ত ও সুন্দর হব। তাঁর মতো পরোপকারী হব।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। লক্ষ্মী দেবীর বাম হাতে থাকে	
২। লক্ষ্মীপূজার ফল	

লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র

বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

অর্থ : হে পদ্মা, পদ্মালয়া, শুভা, তুমি বিশ্বরূপের (নারায়ণের) স্ত্রী। তুমি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। হে দেবী মহালক্ষ্মী, তোমাকে নমস্কার।

সরস্বতী

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। শুভ্র তাঁর গায়ের রং। শ্বেতপদ্ম তাঁর আসন। তাঁর এক হাতে পুস্তক, আর এক হাতে বীণা। তাঁর হাতে বীণা থাকায় তাঁকে বীণাপাণি বলা হয়। তাঁর বাহন শ্বেত হংস।

মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা সরস্বতীপূজা করে। সরস্বতীপূজা করলে বিদ্যালাভ হয়। সরস্বতীপূজা করার মূল কথা হলো জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হওয়া।

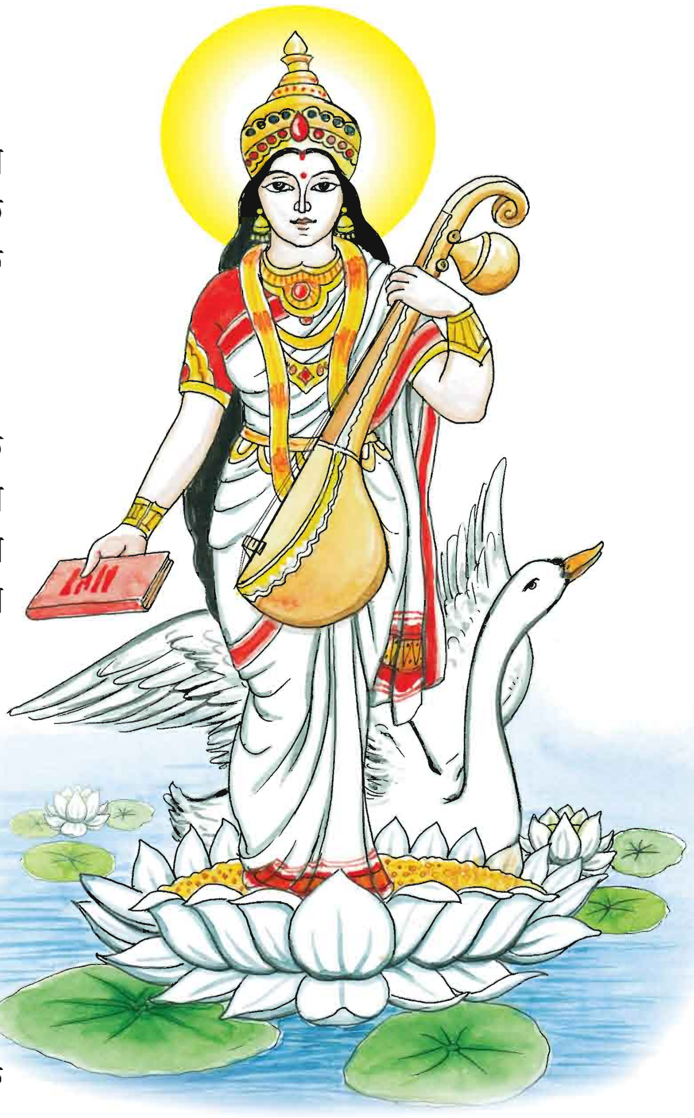
দেবী সরস্বতী

সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

অর্থ : হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী, আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে নমস্কার।

২০২৫

গণেশ

গণেশ

গণেশ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। তাঁর গায়ের রং লাল। তাঁর মাথা হাতির মাথার মতো। তাঁর একটি দাঁত ও একটি শুঁড় আছে। গণেশের পেট আকারে বড়। তাঁর গলায় পৈতা থাকে। তাঁর চার হাত। গণেশের বাহন ইঁদুর।

গণেশপূজা করলে সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ হয়। সকল দেবতার পূজার শুরুতে গণেশপূজা করতে হয়। আমরা সকল কাজের আগে গণেশের নাম স্মরণ করি। কারণ, গণেশ যে সফলতার দেবতা।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। গণেশের বাহন	
২। গণেশের পূজার ফল	

গণেশের প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর-গজাননম্ ।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

২০২৫

অর্থ : একদন্তধারী, বিশাল শরীরের অধিকারী, লম্বা উদর (পেট), গজানন, সকল বিঘ্ন বিনাশকারী, হেরম্বকে (গণেশকে) প্রণাম করি।

দেব-দেবীর পূজা করলে দেহ-মন পবিত্র হয়। মন উদার হয়। সকলে মিলে কাজ করার মানসিকতা জন্মে। দেব-দেবীর পূজা থেকে আমরা এ নৈতিক শিক্ষাই লাভ করি।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈশ্বর যে-কোনো ______ বা রূপ ধারণ করতে পারেন।
২। দেব-দেবীর পূজা করলে ______ পূজা করা হয়।
৩। ব্রহ্মা ______ দেবতা।
৪। ধন-সম্পদের দেবী ______।
৫। সকল দেবতার পূজার শুরুতে ______ পূজা করতে হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বর এক এবং	পেঁচা।
২। শ্বেত হংস	পালন করেন।
৩। লক্ষ্মীর বাহন	পূজা করি।
৪। বিষ্ণু	অদ্বিতীয়।
৫। আমরা দেব-দেবীর	সরস্বতীর বাহন।
	সৃষ্টির দেবতা।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূপ –

ক. ভগবান   খ. গ্রহ
গ. দেব-দেবী   ঘ. নক্ষত্র

২। ঈশ্বর যে-রূপে পালন করেন তাঁর নাম –

ক. দুর্গা	খ. লক্ষ্মী
গ. শিব	ঘ. বিষ্ণু

৩। লক্ষ্মী কিসের দেবী ?

ক. সৃষ্টির	খ. বিদ্যার
গ. শক্তির	ঘ. ধন-সম্পদের

৪। সরস্বতীর বাহন –

ক. ইঁদুর	খ. পেঁচা
গ. শ্বেত হংস	ঘ. ময়ূর

৫। সকল বিঘ্ন বিনাশকারী দেবতার নাম –

ক. কার্তিক	খ. ব্রহ্মা
গ. গণেশ	ঘ. বিষ্ণু

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। তিনজন দেব-দেবীর নাম লেখ।
২। পূজা কাকে বলে?
৩। দেবী সরস্বতীকে বীণাপাণি বলা হয় কেন?
৪। গণেশ কিসের দেবতা?
৫। দেবতা দর্শনের সময় আমাদের করণীয় কী?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। দেব-দেবী বলতে কী বোঝ ? ঈশ্বরের সঙ্গে দেব-দেবীর সম্পর্ক কী ?
২। আমরা দেব-দেবীর পূজা করব কেন ?
৩। লক্ষ্মী দেবীর বর্ণনা দাও।
৪। সরস্বতী দেবীর বর্ণনা দাও।
৫। গণেশের বর্ণনা দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী এবং ধর্মগ্রন্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী

জগতে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিজের সুখ-শান্তির জন্য কাজ করে। অপরের কথা ভাবে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা সকলের সুখ-শান্তির জন্য কাজ করেন। জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। এঁদেরই বলা হয় মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী। যেমন– শ্রীচৈতন্য, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী, মা আনন্দময়ী, রানি রাসমণি প্রমুখ।

এ-সকল মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনী অনুসরণ করলে আমরা চরিত্রবান ও উদার হতে পারব। মানুষ ও জগতের মঙ্গল করতে পারব। এখানে মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ও মহীয়সী নারী মা আনন্দময়ীর জীবনী আলোচনা করছি।

মহাপুরুষ

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ছিলেন একজন বীর সন্ন্যাসী। তিনি ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী।

বিবেকানন্দের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তবে ছেলেবেলায় তাঁর আর একটি নাম ছিল বীরেশ্বর। কিন্তু সবাই তাঁকে 'বিলে' বলে ডাকত।

বিলে সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করত। দরিদ্রদেরও খুব ভালোবাসত। তাদের দেখলেই সে দৌড়ে যেত। ঘরে খাবার জিনিস, জামা-কাপড় যা পেত তা তাদের দিয়ে দিত।

বিলে যেমন ছিল সত্যবাদী, তেমনি নির্ভীক। সত্যকথা বলতে ভয় পেত না। একদিন শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন। বিলে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিল। শিক্ষক রেগে গেলেন। তিনি তাদের পড়া জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বিলে ছাড়া কেউ পারল না। কারণ, বিলে কথাও বলছিল, আবার পড়াও শুনছিল। শিক্ষক তখন তাদের দাঁড়াতে বললেন। সবাই

দাঁড়াল। বিলেও উঠে দাঁড়াল। শিক্ষক বললেন, 'তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।' তখন বিলে বলল, 'কেন, আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমারও হয়েছে।' বিলের এই সত্যবাদিতা ও সাহসিকতায় শিক্ষক তো অবাক !

নরেন্দ্র স্কুল ও কলেজের পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করেন। তিনি বিএ পাস করেন। আইন ও দর্শন বিষয়েও তিনি অনেক পড়াশোনা করেন।

কলেজে থাকতেই নরেন্দ্রের মনে পরিবর্তন আসে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বর কি আছেন ? তাঁকে কি দেখা যায় ? অনেককেই তিনি এ প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু কারো উত্তরই তাঁর সঠিক মনে হতো না। এমন সময় তাঁর দেখা হয় মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন কোলকাতার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। সেখানে তিনি মা-কালীর পূজা করতেন আর সাধনা করতেন। নরেন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন ?' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। ঠিক তোমাকে যেমন দেখছি।' উত্তরটি নরেন্দ্রের ভালো লাগল। তিনি বুঝলেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকেও নরেন্দ্রের ভালো লাগল। এতদিনে তিনি একজন সত্যিকারের গুরু পেলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হলেন।

তখন তাঁর নাম হলো স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। তিনি দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার।

তিনি উপলব্ধি করলেন, দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দেশকে বাঁচাতে হবে। এই দেশকে জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতায় বললেন, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' সবাই তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হন।

শিকাগো সম্মেলনের পর স্বামীজী পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরে বেড়ান। ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মুগ্ধ হয়ে অনেক বিদেশি তাঁর ভক্ত হন। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগ্নী নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ দেশে ফিরলে দেশবাসী সাদরে তাঁকে গ্রহণ করল। তিনি দেশবাসীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বললেন। সমস্ত কুসংস্কার ধ্বংস করে সকলকে এক হতে বললেন। তিনি বললেন, 'শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।' তিনি মানুষ তথা জীবের সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বললেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝালেন, জীবের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

বিবেকানন্দ হাওড়া জেলার বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করেন। সেবার আদর্শ নিয়ে এ মঠ প্রতিষ্ঠিত।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২২ দিন।

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উপদেশ ও নৈতিক শিক্ষা :

(১) পরোপকারই ধর্ম। পরপীড়নই পাপ।
(২) সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা– এ দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।
(৩) মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।
(৪) নিজের উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস – এটাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। জীবের সেবা করলে	
২। স্বাধীনতাই	
৩। ঈশ্বর সম্মুখে আছেন	

বিবেকানন্দের নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ আমরা মেনে চলব এবং আমাদের জীবনে তা প্রয়োগ করব।

মহীয়সী নারী

মা আনন্দময়ী

মা আনন্দময়ী ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। একজন মহাসাধিকা। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য। মাতা মোক্ষদাসুন্দরী। তাঁর পিতৃপুরুষের গ্রামের নাম ছিল বিদ্যাকুট। খেওড়া তাঁর মামাবাড়ি। আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম নির্মলা। তিনি তাঁর পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান।

তাঁর বাবা হরির নাম করতেন। নির্মলা বাবাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বাবা, হরিকে ডাকলে কী হয় ?' বাবা উত্তর দিলেন, 'হরিকে ডাকলে মঙ্গল হয়। কল্যাণ হয়।' এরপর থেকে নির্মলাও হরিকে ডাকতেন। এভাবে ছোটবেলাতেই নির্মলার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাবের প্রকাশ ঘটে। হরিনাম করার সময়, তাঁর শরীরে দেখা দিত এক স্বর্গীয় আলো।

রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রমণীমোহনের ডাক নাম ছিল ভোলানাথ। শ্বশুরবাড়ি এসেও নির্মলার মধ্যে হরি নামের ভাব প্রকাশ পায়।

এরপর শুরু হয় নির্মলার সাধন জীবন। হরিনাম করার সময় কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। চিকিৎসায়ও কিছুই হয় নি। শেষে সবাই বুঝল, তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি দেবী। ক্রমে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্পর্শে অনেকের কঠিন রোগ সেরে যায়। সবাই তাঁকে 'মা' বলে ডাকত। তখন থেকে তাঁর নাম হয় 'মা আনন্দময়ী'।

মা আনন্দময়ীর স্বামী ভোলানাথ ঢাকায় চাকরি করতেন। সেই সূত্রে মা আনন্দময়ীর জীবনের অনেকাংশ কেটেছে ঢাকার শাহবাগে। তার পাশেই ছিল রমনা কালীবাড়ি। মা নিয়মিত সেখানে যেতেন। এ কালীবাড়ির পাশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মা আনন্দময়ীর মন্দির। সেখানে তিনি সাধনা করতেন। বর্তমানে ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির পাশে মা আনন্দময়ীর মন্দির আছে। এটাই মা আনন্দময়ীর আদি মন্দির।

মা আনন্দময়ী

জন্মভূমি খেওড়াতে আনন্দময়ী মায়ের নামে আশ্রম আছে। তাঁর নামে একটি বিদ্যালয়ও আছে। খেওড়া আনন্দময়ী উচ্চবিদ্যালয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর নামে মন্দির আছে। তাঁর শেষ জীবন কেটেছে ভারতে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। মা আনন্দময়ীর জন্মস্থান	
২। মা আনন্দময়ীর প্রকৃত নাম	
৩। মা আনন্দময়ী ছিলেন একজন	
৪। খেওড়াতে মা আনন্দময়ীর নামে আছে	

মা আনন্দময়ীর ধর্মকথা সুন্দর। তিনি বলেছেন, জগতে মত ও পথের শেষ নেই। তবে সব মতের মিলের প্রয়োজন। সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায়। তাঁর বাণী ছিল উদার। সব ধর্ম তাঁর কাছে সমান ছিল। সব মানুষও সমান। পবিত্র তাঁর জীবন। শিশুদের জন্য তাঁর অনেক নৈতিক শিক্ষামূলক উপদেশ আছে। এখানে তিনটি উপদেশ দেওয়া হলো :

(১) ভগবানের নাম করবে। তাতে মঙ্গল হবে।
(২) গুরুজন ও বাবা-মায়ের কথা শুনবে। ভালো করে লেখাপড়া শিখবে।
(৩) অন্তরে যদি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা থাকে, ভক্তি থাকে – তাহলে আর ভয় নেই।

মা আনন্দময়ীর এ-সকল উপদেশ পালন করলে আমাদের জীবনে উন্নতি হবে।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মহাপুরুষগণ জগতের ______ জন্য কাজ করেন।
২। শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন ______ কালীবাড়িতে।
৩। বিবেকানন্দের আসল নাম ছিল ______।
৪। মা আনন্দময়ী ______ নারী ছিলেন।
৫। সব ______ তাঁর কাছে সমান ছিল।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। স্বামী বিবেকানন্দ	শেষ নেই।
২। বিলের সত্যবাদিতায় শিক্ষক	সত্যকে পাওয়া যায়।
৩। মা আনন্দময়ীর স্বামীর নাম	একজন মহাপুরুষ।
৪। জগতে মত ও পথের	একজন মহীয়সী নারী।
৫। সব পথেই	অবাক হলেন।
	রমণীমোহন চক্রবর্তী।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। স্বামী বিবেকানন্দ কী ছিলেন?

ক. বীরযোদ্ধা
খ. বীরপুরুষ
গ. বীর সন্ন্যাসী
ঘ. মহাবীর

২। স্বামী বিবেকানন্দ কতো খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৮৬১
খ. ১৮৬২
গ. ১৮৬৩
ঘ. ১৮৬৪

৩। কে স্বামী বিবেকানন্দের গুরু ছিলেন?

ক. লোকনাথ ব্রহ্মচারী
খ. অনুকূল চন্দ্র
গ. শ্রীচৈতন্য
ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণ

৪। মা আনন্দময়ী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. খেওড়া
খ. নওগাঁ
গ. মাওয়া
ঘ. উত্তরা

৫। মা আনন্দময়ী কোন তারিখে পরলোক গমন করেন?

ক. ২৫শে আগস্ট
খ. ২৭শে আগস্ট
গ. ২৮শে আগস্ট
ঘ. ৩০শে আগস্ট

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মহাপুরুষ কাকে বলে?
২। মহীয়সী নারী কাকে বলে?
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ কার পূজা করতেন?
৪। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় কোন শহরে ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন?
৫। মা আনন্দময়ীর আদি মন্দির কোথায় অবস্থিত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন বর্ণনা কর।
২। বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
৩। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় কী বলেছিলেন?
৪। মা আনন্দময়ীর সাধনজীবন বর্ণনা কর।
৫। মা আনন্দময়ীর দুটি উপদেশ লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থ

ধর্ম মানুষের মঙ্গল করে। জগতের কল্যাণ করে। ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে। ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শেখায়। যে-গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে, তাকে বলে ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থে অনেক জ্ঞানের কথা থাকে। ধর্মগ্রন্থ মানুষকে সৎ উপদেশ দেয়। আমাদের ভালো মানুষ হতে শেখায়।

আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। এর আরেক নাম হিন্দুধর্ম। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। এছাড়া আরও ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন – উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

নিম্নে রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

রামায়ণ

রামায়ণ হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ। এতে রামের কাহিনী আছে। তাই এর নাম হয়েছে রামায়ণ।

মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। রচয়িতা বাল্মীকি। পরে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। রামায়ণের কাহিনীকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় কাণ্ড। তাই বলা হয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। কাণ্ডগুলো হলো : (১) আদি (২) অযোধ্যা (৩) অরণ্য (৪) কিষ্কিন্ধ্যা (৫) সুন্দর (৬) যুদ্ধ এবং (৭) উত্তর কাণ্ড।

(১) আদি কাণ্ড

অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর তিন স্ত্রী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার ছেলে রাম। কৈকেয়ীর ছেলে ভরত। আর সুমিত্রার দুই ছেলে – লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাম-লক্ষ্মণ ছোটবেলা থেকেই বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র এলেন অযোধ্যায়। আশ্রমে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য তিনি রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথেই রাম তাড়কা রাক্ষসীকে তীর দিয়ে মেরে ফেলেন।

তখন মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। তাঁর বড় মেয়ে সীতার বিবাহ হবে। কিন্তু একটা শর্ত ছিল। জনকের কাছে একটা ধনুক ছিল। দেবতা শিব তাঁকে একটা ধনুক দিয়েছিলেন। শিবের আরেক নাম হর। তাই হরের নামানুসারে ধনুকটিকে বলা হতো হরধনু। শর্ত হলো – এই হরধনু যে ভাঙতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে

সেখানে নিয়ে গেলেন। রাম হরধনু ভেঙে ফেললেন। তাই সীতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

এই খবর চলে গেল অযোধ্যায়। রাজা দশরথ অন্য দুই ছেলে ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় এলেন। তারপর রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হলো। জনকের ছোট মেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হলো লক্ষ্মণের। আর জনকের ভাই কুশধ্বজের ছিল দুই মেয়ে। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। মাণ্ডবীর সঙ্গে বিয়ে হলো ভরতের। আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে বিয়ে হলো শত্রুঘ্নের। এরপর সবাই সানন্দে অযোধ্যায় ফিরলেন।

ছোটবেলায় রামের বীরত্বপূর্ণ দুটি কাজ :
১।
২।

(২) অযোধ্যা কাণ্ড

রাজা দশরথের বয়স হয়েছে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, বড় ছেলে রামকে যুবরাজের দায়িত্ব দেবেন। এটাই নিয়ম। কিন্তু বাদ সাধলেন কৈকেয়ী। তাঁর দাসী মন্থরার পরামর্শে।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন

দশরথ একসময় কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। মন্থরা সেই দুটি বর এখন চাইতে বলল কৈকেয়ীকে। প্রথম বরে ভরত রাজা হবে। আর দ্বিতীয় বরে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাবে। কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ অত্যন্ত ভেঙে পড়লেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করলে অধর্ম হয়। কথাটা রামের কানে গেল। তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গেলেন। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ।

নিচের ছক পূরণ করি :

ছবিটিতে কে কে আছেন ?	ছবির লোকগুলো কোথায় যাচ্ছেন ?
১।	
২।	
৩।	

এদিকে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হলো। ভরত ছিলেন তখন মামাবাড়ি। অযোধ্যায় ফিরে তিনি মাকে ভর্ৎসনা করলেন। তারপর চললেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। রাম এলেন না। ভরত তখন রামের পাদুকা নিয়ে এলেন। পাদুকা সিংহাসনে রাখলেন। আর সিংহাসনের পাশে বসে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

(৩) অরণ্য কাণ্ড

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যে বাস করছেন। চৌদ্দ বছরের বনবাস। বাকি আর এক বছরও নেই। এমন সময় এক বিপদ ঘটল। তখন লঙ্কার রাজা ছিলেন রাক্ষস রাবণ। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ লঙ্কা। সেখানে যাওয়া খুব কঠিন। সেই লঙ্কা থেকে ছদ্মবেশে রাবণ এসে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেলেন।

(৪) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যা বানরদের রাজ্য। রাম-লক্ষ্মণ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গেলেন। সেখানে তাঁদের বন্ধুত্ব হয় বীর সুগ্রীবের সঙ্গে। সুগ্রীবের বড় ভাই বালী। তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল না। রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করেন। বালী তাঁর হাতে নিহত হন। সুগ্রীব রাজা হন। বিনিময়ে তিনি সীতার খোঁজে চারদিকে বানরদের পাঠান।

(৫) সুন্দর কাণ্ড

হনুমান বানরদের মধ্যে এক বড় বীর। তিনি লঙ্কায় গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেখানকার অশোকবনে সীতাকে দেখতে পেলেন। লণ্ডভণ্ড করলেন লঙ্কা। পুড়িয়ে দিলেন লঙ্কার ঘর-বাড়ি। অনেক রাক্ষসও মারা পড়ল।

(৬) যুদ্ধ কাণ্ড

হনুমান ফিরে এসে রামকে সীতার সংবাদ দিলেন। কিন্তু রাম লঙ্কায় পৌঁছবেন কী করে ? সমুদ্র পার হতে হবে যে! শেষে বানরদের সাহায্যে সমুদ্রে এক ভাসমান সেতু তৈরি করলেন। দলবল নিয়ে পৌঁছলেন লঙ্কায়। লঙ্কা আক্রমণ করলেন। রাবণের ভাই বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু রাবণ শুনলেন না। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিলেন।

রাম-রাবণের যুদ্ধ

রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হলো।

অনেক রাক্ষস মারা গেল। রাবণও রামের হাতে নিহত হলেন। রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন। ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। রাম হলেন যুবরাজ।

(৭) উত্তর কাণ্ড

আনন্দেই কাটছিল দিন। প্রজারা রামের শাসনে খুব ভালোই ছিল। রামও প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের সুখও বিসর্জন দিতে পারতেন।

২০১৯

প্রজাদের খুশি করার জন্য তিনি তাই একদিন সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। তখন সীতা মা হতে যাচ্ছেন। বনে বাল্মীকি মুনির আশ্রম। সেখানে আশ্রয় পেলেন সীতা। সীতার দুই ছেলে হলো। কুশ ও লব। তারা যমজ ভাই। কুশ-লব বনেই বড় হয়। অনেক কাল পরে পিতা-পুত্রের পরিচয় হয়। সীতা দুই ছেলেকে নিয়ে অযোধ্যায় ফেরেন। কিন্তু রাজসভায় সীতা আবার মনে কষ্ট পেলেন। তিনি পৃথিবী মাতার নিকট আশ্রয় চাইলেন। তখন মাটি ফেটে ভিতর থেকে একটি সিংহাসন উঠে এলো। সীতা তাতে চড়ে পাতালে প্রবেশ করলেন।

রামায়ণের কাহিনী থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই, তা হলো : পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করা। বড় ভাইকে শ্রদ্ধা করা। অধর্মের বিনাশ করা। উপযুক্ত রাজা হওয়া। সর্বদা প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা করা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা। এগুলো আমরা আমাদের জীবনেও প্রয়োগ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ______ ।

২। রামায়ণে ______ কাহিনী আছে।

৩। অযোধ্যার রাজা ছিলেন ______ ।

৪। রাম ______ ভেঙে ফেললেন।

৫। সিংহাসনে চড়ে সীতা ______ প্রবেশ করলেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। আমাদের ভালো মানুষ হতে শেখায়	বাল্মীকি।
২। মূল রামায়ণ রচনা করেন	বনে গেলেন।
৩। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য	ধর্ম।
৪। লঙ্কার রাজা	জীবনে।
৫। রামায়ণের শিক্ষা প্রয়োগ করব	রাবণ।
	দশরথ।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। বাংলা ভাষায় রামায়ণ কে অনুবাদ করেন ?

ক. বাল্মীকি   খ. কৃত্তিবাস

গ. ব্যাসদেব   ঘ. তুলসী দাস

২। রামায়ণে কয়টি কাণ্ড আছে ?

ক. ৪টি　　খ. ৫টি

গ. ৬টি　　ঘ. ৭টি

৩। রাজা দশরথের কয়জন ছেলে ছিল ?

ক. ৪ জন　　খ. ৩ জন

গ. ২ জন　　ঘ. ১ জন

৪। রাম কতো বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন ?

ক. ১১ বছর　　খ. ১২ বছর

গ. ১৩ বছর　　ঘ. ১৪ বছর

৫। বনবাসে সীতা কার আশ্রমে ছিলেন ?

ক. ব্যাসদেবের　　খ. কপিলমুনির

গ. বাল্মীকিমুনির　　ঘ. দুর্বাসামুনির

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ধর্মগ্রন্থ কাকে বলে?

২। বিশ্বামিত্র কেন রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

৩। কৈকেয়ী দশরথের কাছে কী কী বর চেয়েছিলেন?

৪। রাম বনে গিয়েছিলেন কেন?

৫। রাম বনে গেলে ভরত কী করেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা কী?

২। রামায়ণের কাণ্ডগুলোর নাম লেখ। যে-কোনো একটি কাণ্ডের বর্ননা দাও।

৩। রাম কিরূপে লঙ্কায় পৌঁছলেন?

৪। রামায়ণ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

৫। রামায়ণের শিক্ষা আমাদের জীবনে অনুসরণ করব কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

সহমর্মিতা

একটি সত্য ঘটনা।

মমতা আর কমল। একই স্কুলে পড়ে। মমতা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। আর কমল পড়ে প্রথম শ্রেণিতে। কমল তার সহপাঠীদের সঙ্গে স্কুলে যায়। সবাই খুব চঞ্চল। রাস্তায় হাঁটে তো না, যেন দৌড়ায়। একদিন ওরা রাস্তায় এরকম ছোটাছুটি করছে। এমন সময় পাশের রাস্তা দিয়ে ওদের সঙ্গে এসে মিলিত হলো মমতা। সে কমলকে ছোটাছুটি করতে দেখে বারণ করল। বলল, রাস্তায় এলোমেলো ছোটাছুটি করো না, কমল। ধীরে-সুস্থে চলতে হয়। নইলে হোঁচট খাবে।

কার কথা কে শোনে ! একটু পরেই সত্য হলো মমতার কথা। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল কমল। ওর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট লেগেছে। রক্ত ঝরছে। কেঁদে উঠল সে।

স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে। কমলের সহপাঠীরা কমলকে ফেলে চলে গেল।

কিন্তু মমতা তা করল না। সে কমলকে বলল, 'ছি, কাঁদে না। আমি দেখছি।' মমতার স্কুলব্যাগে তার মা সবসময় ডেটল, তুলা, ব্যান্ডেজ এসব দিয়ে রাখেন। কখন দরকার হয় বলা তো যায় না! এখন দরকার পড়ল। মমতার নিজের জন্য নয়। কমলের জন্য।

মমতা কমলের চোট লাগা বুড়ো আঙুলে ঔষধ লাগাল। তারপর যত্ন করে বেঁধে দিল।

কমলের প্রতি মমতার সহমর্মিতা

কমলকে ধরে ওঠালো মমতা। তারপর মমতা ওর স্কুলব্যাগ নিল। কমল মমতাকে ধরে-ধরে পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্কুলে গেল।

স্কুলে গিয়ে মমতা আগে কমলকে তার ক্লাসে পৌঁছে দিল। কমলদের ক্লাসের শিক্ষক মমতার কাছে সব শুনলেন। তিনি খুব খুশি হলেন।

ওদিকে মমতাদের ক্লাসের শিক্ষক দেরি করে ক্লাসে আসার জন্য খুব রাগ করলেন। বললেন, 'ক্লাসে আসতে দেরি হলো কেন?'

মমতা সব খুলে বলল। শিক্ষক খুবই খুশি হলেন।

তখন তিনি ক্লাসের সবাইকে বললেন, 'জানো, আজ মমতা কমলের জন্য যা করল, তাকে কী বলে?'

শিক্ষার্থীরা : কী বলে, স্যার?

শিক্ষক : একে বলে সহমর্মিতা।

ঠিক তাই।

সহমর্মিতা বলতে বোঝায় অপরের সুখ-দুঃখ বা আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে মনে করা। কমলের সহপাঠীরা কমলের দুঃখকে নিজেদের দুঃখ বলে মনে করে নি। কিন্তু মমতা কমলের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করেছে।

আমরা পাড়ায়, গ্রামে সবাই মিলেমিশে বাস করি। সেখানে সুখে-দুঃখে সকলকে একসঙ্গে থাকতে হয়। একসঙ্গে চলতে হয়। একেই বলে সমাজ। সমাজে পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হয়। তাহলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমাজে শান্তি বিরাজ করে।

তাই সমাজের জন্য সহমর্মিতা খুবই দরকারি বিষয়।

সহমর্মিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো জাতি বা ধর্ম বিচার করতে নেই। সকল জাতির ও সকল ধর্মের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহমর্মিতা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে একটি গল্প শোনাই :

অর্জুনের সহমর্মিতা

মহাভারতের কথা।

মহাভারতের সবচেয়ে বড় বীর অর্জুন। একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন খাণ্ডব নামক এক বনের পাশে বেড়াতে এসেছিলেন।

তখন সেখানে এলেন অগ্নিদেব। তিনি জানালেন যে এক রাজা বারো বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন। সে যজ্ঞের ঘি খেয়ে তার অগ্নিমান্দ্য হয়েছে। তিনি গেলেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি খাণ্ডব বন দগ্ধ কর।' কিন্তু হাতিরা শুঁড় দিয়ে এবং নাগেরা মাথায় করে জল সেচ করে আগুন নিভিয়ে দেয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্য চাইলেন। তাঁরা অগ্নিদেবের প্রতি সহমর্মী হয়ে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। কারণ, এর দ্বারা অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য দূর হবে।

খাণ্ডব বনে জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুনে পুড়ে মরতে লাগল বনের বাসিন্দারা, আর যত পশু। শোঁ-শোঁ শব্দ করে শত-শত লকলকে জিভের মতো আগুনের শিখা আকাশে মাথা তুলল। পাখিরাও উড়ে পালাতে পারল না। সেই আগুনের শিখায় পুড়ে মারা পড়তে লাগল।

দানবদের এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ময়দানব। খাণ্ডব বনের তক্ষক নাগের আবাস থেকে তিনি বের হচ্ছিলেন। তখন তিনিও আগুনের দ্বারা আক্রান্ত হন। ময়দানবের আচরণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সন্তুষ্ট ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন জানেন, ময়দানব অনেক শত্রুতা করেছেন। অনেককে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তবু অর্জুন তাঁকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করলেন। এভাবে বীর অর্জুন শত্রুর প্রতিও সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন।

আমরাও এমনি করে শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব। তাহলে শত্রুও মিত্রে পরিণত হবে। আর শত্রুতা করবে না। সমাজে থাকবে সম্প্রীতি ও শান্তি।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও সহমর্মিতা

আমাদের সমাজে এমন অনেক শিশু আছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখে দেখতে পায় না। কেউ কেউ কানে শুনতে পায় না। কেউ কেউ কথা বলতে পারে না। হাঁটা-চলাও করতে

পারে না। এদের জন্য বিশেষ সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। এদের চলাফেরা, লেখাপড়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। আবার কিছু কিছু শিশু বা মানুষ আছে, যাদের বয়স বাড়লেও বুদ্ধি বাড়ে না। শুনে মনে রাখতে পারে না। নিজের কাজ নিজে গুছিয়ে করতে পারে না। এদেরও বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এদের জন্যও বিশেষভাবে যত্ন নিতে হয়। এ ধরনের শিশুদের বলা হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। তবে শরীর ও বুদ্ধির এ অপূর্ণতার জন্য এরা নিজেরা দায়ী নয়। এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে সহমর্মিতা দেখানো দরকার।

প্রথমেই লক্ষ রাখতে হবে, তাদেরকে যেন আমরা আমাদের থেকে আলাদা করে না ভাবি। তাদের সকল কাজে আমরা যেন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এ সকল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এমনকি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গে খেলব, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের নিয়ে অংশগ্রহণ করব। এভাবেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি আমরা সবসময় সহমর্মিতা প্রকাশ করব।

সকল জাতি ও ধর্মের মানুষ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ ও শিশুরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সকলেই সমান। কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। আমরা জানি ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। সুতরাং হিন্দুধর্ম অনুসারে আমরা সহমর্মিতা প্রকাশকে ধর্মের অঙ্গ বলে এবং একটি নৈতিক গুণ বলে জানব। সবসময় নিজেদের আচরণে সহমর্মিতা প্রকাশ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মমতার আচরণে শিক্ষক খুবই ______ হলেন।
২। মমতা কমলের প্রতি ______ দেখিয়েছিল।
৩। সকল ধর্মই ______ ।
৪। সহমর্মিতা ______ অঙ্গ।
৫। চোখে দেখতে পায় না, এমন শিশুকে বলা হয় ______ শিশু।

২০১৮

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মমতার স্কুলব্যাগে থাকে	সহমর্মিতা।
২। অন্যের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানোর নাম	অগ্নিদেব।
৩। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন বেড়ানোর সময় এলেন	গুণ।
৪। সহমর্মিতা একটি নৈতিক	ডেটল।
৫। সহমর্মিতা দেখানোর সময় বিচার্য নয়	জাতি-ধর্ম।
	মানবিক।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। কে কমলকে সহমর্মিতা দেখিয়েছিল ?

ক. সমতা
খ. মমতা
গ. জনতা
ঘ. একতা

২। কমলের প্রতি মমতার আচরণের মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. কঠোরতা
খ. কোমলতা
গ. সহমর্মিতা
ঘ. সেবা

৩। আমরা সহমর্মিতা প্রকাশ করব কেন ?

ক. লোককে দেখানোর জন্য
খ. সহমর্মিতা নৈতিক গুণ বলে
গ. লেখাপড়ায় ভালো হওয়া যায় বলে
ঘ. প্রশংসা পাওয়া যায় বলে

৪। আমরা কার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব ?

ক. কেবল মা-বাবা, ভাই-বোনদের প্রতি
খ. কেবল সহপাঠীদের প্রতি
গ. কেবল পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি
ঘ. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি

৫। অর্জুন কার প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন ?

ক. শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
খ. তক্ষকের প্রতি
গ. ময়দানবের প্রতি
ঘ. দুর্যোধনের প্রতি

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ‘সহমর্মিতা’ কথাটির অর্থ কী?
২। চারটি ধর্মের নাম লেখ।
৩। অর্জুন কোথায় এবং কার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন?
৪। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর একটি দৃষ্টান্ত দাও।
৫। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কী করা হয়েছে?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। সহমর্মিতা কী? বুঝিয়ে লেখ।
২। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করব কেন?
৩। অর্জুন ময়দানবের প্রতি কীভাবে সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন?
৪। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে কাদের বোঝায়?
৫। ‘সহমর্মিতা ধর্মের অঙ্গ’ কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৬। হিন্দুধর্মে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সম্পর্কে কিরূপ আচরণ করার কথা বলা হয়েছে?

পঞ্চম অধ্যায়

নম্রতা, ভদ্রতা ও অগ্রাধিকার

নম্রতা

'নম্রতা' কথাটি আমাদের আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত। স্বভাব ও আচরণে বিনয় ভাব প্রকাশ করাকে বলে 'নম্রতা'। যারা নম্র, তারা শান্ত-শিষ্ট আচরণ করে। সুন্দর করে কথা বলে। অন্য মানুষকে ভালোবাসে।

নম্র কথাটির অর্থ হলো, যা নোয়ানো যায়। তার মানে যা কঠিন নয়, কোমল। গাছের একটা শক্ত ডালকে নোয়ানো যায় না। শক্ত ডাল নত হয় না। কিন্তু একটি নরম ডাল নত হয়। সেটিকে সহজে নোয়ানো যায়। নরম ডালের মতো আচার-আচরণের কোমলতা বা নমনীয়তাকেই 'নম্রতা' বলা হয়।

আমাদের সমাজে আরেক রকমের মানুষ আছে। তারা খুবই কঠিন। কর্কশ ভাষায় কথা বলে। সহজেই রেগে যায়। অন্য মানুষকে ভালোবাসে না, সম্মান করে না। তারা উদ্ধত। তারা মানুষের ভালোবাসা পায় না। অন্যদিকে যারা নম্র আচরণ করে, তাদের সবাই ভালোবাসে। এর ফলে সমাজের মঙ্গল হয়। নম্র আচরণ সম্মান বাড়ায়। কবির ভাষায় –

'বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।'

এখানে 'বড়' হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে ভালো মানুষ হওয়া। আর 'ছোট' হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে নম্র হওয়া, বিনয়ী হওয়া।

আমরা বড়দের সঙ্গে সবসময় নম্র আচরণ করব। কেবল তাই নয়, সহপাঠী, সমবয়সী ও ছোটদের সঙ্গেও নম্র আচরণ করব। নম্রতার দ্বারা জীবন সুন্দর হয়। আমরাও নম্র আচরণ করে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলব।

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি মনোযোগ দিই :

১। নম্র আচরণ করলে সবাই ভালোবাসে

২। বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে

৩। নম্র আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর করে

৪। আমরা সবসময় নম্র আচরণ করব।

২০২১

ভদ্রতা

নম্রতার সঙ্গে ভদ্রতা কথাটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভদ্র কথাটির অর্থ হলো মঙ্গল। ভদ্রতা হচ্ছে মঙ্গলকর বা ভালো আচরণ। মার্জিত আচরণ। চলনে-বলনে, সাজে-পোশাকে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। আমরা গুরুজনদের প্রণাম করি। পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে বলি – 'ভালো আছ তো ?'

ক্লাসে শিক্ষক প্রবেশ করলে আমরা সকলে উঠে দাঁড়াই। তিনি বসতে বললে বসি। এ সকল আচরণের মধ্য দিয়ে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। ভদ্র হতে গেলে নম্র হতে হয়। নম্রতার মধ্য দিয়ে ভদ্রতা প্রকাশ পায়। ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে –

গুরুদেবকে অর্থাৎ শিক্ষককে প্রণাম করবে। বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন –

তৃণের মতো নিচু হও। গাছের মতো সহনশীল হও।

সুতরাং নম্রতা-ভদ্রতা ধর্মের অঙ্গ। ধার্মিকের গুণ। সজ্জনের গুণ।

নম্রতা ও ভদ্রতা আমাদের বিনয়ী ও সহনশীল করে। আমরা যদি সবসময় আমাদের আচরণে নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ করি, তাহলে তা গোটা পরিবেশ, গোটা সমাজ সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হবে। আমরা সকলে সেখানে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করতে পারব।

সুতরাং সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তির জন্য আমাদের আচরণে নম্রতা ও ভদ্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা নম্র-ভদ্র আচরণ সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নম্রতা-ভদ্রতা সহজেই প্রকাশ করতে পারব। সকলের প্রতি আমরা নম্র-ভদ্র আচরণ নিশ্চয় প্রদর্শন করতে পারব।

এখন ধর্মগ্রন্থ মহাভারত থেকে নম্রতা ও ভদ্রতার একটি উপাখ্যান জানব ।

যুধিষ্ঠিরের নম্রতা-ভদ্রতা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ ভাই ও তাঁদের সৈন্য-সমর্থকেরা।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ একশত ভাই। তাঁদের সৈন্যগণ ও সমর্থকেরা। যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনেরা কাকাত-জেঠতুত ভাই। রাজ্যের অধিকার নিয়ে লড়াই। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে তাঁর প্রাপ্য রাজ্য দিচ্ছিলেন না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করতে নামলেন। আত্মীয়-কুটুম্ব দুপক্ষেই ছিল। যুধিষ্ঠিরদের পিতামহের ভ্রাতা অর্থাৎ ঠাকুরদার বড় ভাই ভীষ্ম ছিলেন দুর্যোধনের দলে। দুর্যোধনের দলে আরও ছিলেন দ্রোণাচার্য। এই দ্রোণাচার্য ছিলেন যুধিষ্ঠিরদেরও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার গুরু। এরকম যুধিষ্ঠিরদের আরও অনেক গুরুজন ঐ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের নম্রতা-ভদ্রতা

তখন যুদ্ধ হতো সামনাসামনি।

যুদ্ধের জন্য দুপক্ষই তৈরি। তখন অবাক কাণ্ড করলেন যুধিষ্ঠির। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করলেন। এগিয়ে চললেন শত্রু শিবিরের দিকে।

কী ব্যাপার !

সবাই বারণ করলেন। কিন্তু থামলেন না যুধিষ্ঠির। সোজা গিয়ে প্রণাম করলেন পিতামহ ভীষ্মকে। ভীষ্ম আশীর্বাদ করলেন, 'বিজয়ী হও'। তারপর গিয়ে প্রণাম করলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণকে। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করলেন।

যুধিষ্ঠির বিপক্ষ দলের গুরুজনদেরও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। ভদ্রতা দেখিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও ভদ্রতা ভোলেন নি তিনি।

কেনই বা ভুলবেন ?

ভদ্রতা যে ধার্মিকের গুণ !

অগ্রাধিকার

নম্রতা ও ভদ্রতার সঙ্গে আরও একটি বিষয় জড়িত। তা হচ্ছে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া কথাটির মানে হচ্ছে সমাজে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নিজে আগে-ভাগে তা না নেওয়া। অন্যকে সুযোগ-সুবিধা নিতে এগিয়ে দেওয়া।

সকলের আগে কাউকে সুবিধা লাভের সুযোগ দেওয়ার নাম অগ্রাধিকার।

ধরা যাক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করতে হবে। সেখানে আমি পরে এলাম। আমি এসেই লাইনের আগে গিয়ে দাঁড়াব না। অন্যে সুযোগ দিলেও না। এভাবে অন্যকে আগে সুযোগ দেওয়াকে বলা হয় অগ্রাধিকার।

অগ্রাধিকার একটি নৈতিক গুণ। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগ ও উদারতা প্রকাশ পায়। ধৈর্য বাড়ে। সহনশীলতার অনুশীলন হয়। এর মধ্য দিয়ে নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশ পায়। অন্যকে অগ্রাধিকার দিলে নিজে ধৈর্যশীল, সহনশীল, নম্র ও ভদ্র মানুষে পরিণত হওয়া যায়। এর ফলে সমাজে সকলেই সকলের প্রতি উদার ও সহনশীল হয়। সমাজের মঙ্গল হয়। সমাজ হয়ে ওঠে শান্তিময়, আনন্দময়।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনদের অস্ত্রগুরু ছিলেন ______।
২। যুদ্ধক্ষেত্রেও ______ দেখাতে ভোলেন নি।
৩। নিজে আগে সুযোগ না নিয়ে অন্যকে সুযোগ দেওয়াকে ______ বলা হয়।
৪। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া একটি ______ গুণ।
৫। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে মানুষ ______ হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। নম্র-ভদ্রকে সবাই →	বিনয়।
২। উদ্ধত লোক নম্রের	ভালোবাসে।
৩। ছোটদের সঙ্গেও আমাদের আচরণ হবে	বিপরীত।
৪। প্রশ্নের সঙ্গে থাকবে	অগ্রাধিকার দেওয়া।
৫। অন্যকে আগে সুযোগ দেওয়াকে বলে	নম্র।
	ধৈর্য।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। নম্রতা একটি –

ক. আচরণের বিষয়   খ. গর্বের বিষয়
গ. শিক্ষার বিষয়   ঘ. কাজের বিষয়

২। যারা সহজেই রেগে যায় তাদের কী বলে ?

ক. ভদ্র   খ. নম্র
গ. অহংকারী   ঘ. উদ্ধত

৩। চলনে-বলনে, সাজে-পোশাকে কী প্রকাশ পায় ?

ক. সভ্যতা   খ. সম্পদ
গ. ভদ্রতা   ঘ. শিক্ষা

২০১৮

৪। নিচের কোন ব্যক্তি মহাভারতে ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন ?

ক. ভীম   খ. অর্জুন

গ. নকুল   ঘ. যুধিষ্ঠির

৫। যুধিষ্ঠির কার প্রতি ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন ?

ক. শ্রীকৃষ্ণ   খ. ভীষ্ম

গ. ইন্দ্র   ঘ. দুর্যোধন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। নম্রতা বলতে কী বোঝ ?

২। ভদ্র আচরণ প্রকাশের উপায় লেখ।

৩। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া কথাটির অর্থ কী ?

৪। যুধিষ্ঠির কোথায় এবং কার কাছে গিয়ে নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন ?

৫। 'তৃণের মতো নিচু হও' – কথাটি কে বলেছেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। নম্র-ভদ্র আচরণের উপকারিতা কী ?

২। যুধিষ্ঠির কীভাবে ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন ? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। 'নম্রতা ধর্মের অঙ্গ' – কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

৪। আমরা অন্যকে অগ্রাধিকার দেব কেনো?

৫। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার একটি উদাহরণ দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সততা ও সত্যবাদিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সততা

সদা সত্যকথা বলা ও সৎপথে চলাকেই বলে সততা। সৎ চিন্তা করা, সৎ কাজে নিযুক্ত থাকাও সততা। কারো জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ না করার নামও সততা। এরূপ সৎ ব্যক্তিদের সবাই সম্মান করে। এঁদের কোনো লোভ থাকে না। দেবতারাও এঁদের সততায় খুশি হন। সততা ধর্মের অঙ্গ এবং একটি নৈতিক গুণ। নিম্নে সততার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

কাঠুরে ও জলদেবতা

এক গ্রামে ছিল এক কাঠুরে। তার ছিল একটি লোহার কুঠার। কুঠার দিয়ে সে নিত্য কাঠ কাটত। সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাত।

গ্রামের পাশে ছিল এক নদী। তার পাড়ে ছিল এক বন। একদিন কাঠুরে সেই বনে গেল কাঠ কাটতে।

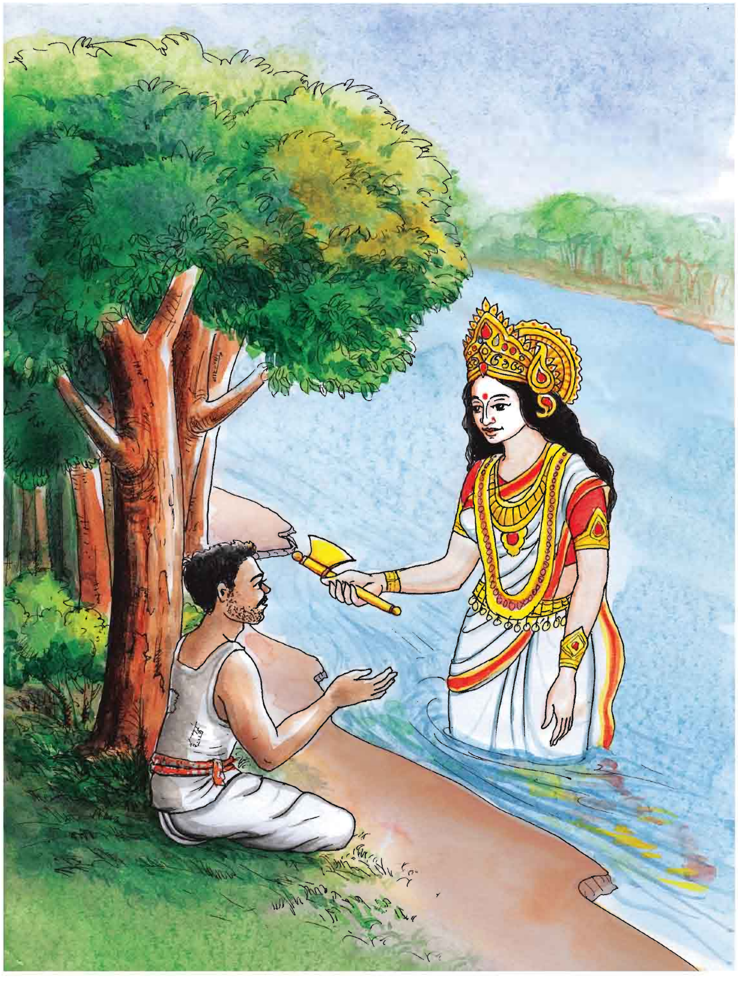

জলদেবতা কাঠুরেকে একটি সোনার কুঠার দিচ্ছেন

২০১৫

হঠাৎ তার কুঠারখানা নদীতে পড়ে গেল। কাঠুরে তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। কুঠার না থাকলে সে কাঠ কাটতে পারবে না। আর কাঠ না কাটতে পারলে তার সংসার চলবে না। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে না খেয়ে থাকবে।

এমন সময় নদী থেকে জলদেবতা উঠে এলেন তার কাছে। হাতে একখানা রুপার কুঠার। জলদেবতা কাঠুরেকে বললেন, 'দেখ তো এটা তোমার কুঠার কিনা।'

কাঠুরে দেখে বলল, 'না, এ কুঠার আমার নয়।'

জলদেবতা চলে গিয়ে আবার এলেন। হাতে একখানা সোনার কুঠার। কাঠুরেকে বললেন, 'দেখ তো এবার, এটা তোমার কিনা।'

কাঠুরে আবারও বলল, 'না, এটাও আমার নয়।'

জলদেবতা জলে নেমে পুনরায় উঠে এলেন। তাঁর হাতে একখানা লোহার কুঠার। তিনি কাঠুরেকে বললেন, 'এখন দেখ তো এটা তোমার কিনা।'

কাঠুরে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার।'

কাঠুরের এ সততায় জলদেবতা মুগ্ধ হন। তিনি কাঠুরেকে তিনটি কুঠারই দিয়ে দেন। তারপর থেকে কাঠুরের সংসারে আর অভাব থাকল না।

'কাঠুরে ও জলদেবতা' গল্প থেকে আমরা জানলাম যে, সততা একটি বড় গুণ। সৎ ব্যক্তিদের সবাই পছন্দ করে। দেবতারাও তাদের ভালোবাসেন। তাই আমাদেরও সৎ হতে হবে। এটাই এ গল্পের নৈতিক শিক্ষা।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। কাঠুরে সোনার কুঠার না নিয়ে যে গুণের পরিচয় দিয়েছে	
২। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিয়েছিল	
৩। কাঠুরেকে সহযোগিতা করেছিলেন	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সত্যকথা বলা ও সৎ পথে চলাকে ______ বলে ।
২। সৎ ______ সকলেই সম্মান ও পছন্দ করে।
৩। কাঠুরের নিজের কুঠারটি ছিল ______ তৈরি।
৪। কাঠুরে রুপার ও সোনার কুঠার না নিয়ে ______ পরিচয় দিয়েছিল।
৫। কাঠুরের গল্প অনুসরণ করে আমরাও ______ হব।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। সৎ কাজে নিযুক্ত থাকাও →	রুপার।
২। সততা ধর্মের	অঙ্গ।
৩। সততা একটি নৈতিক	সাগরে।
৪। কাঠুরের নিজের কুঠারটি পড়ে গিয়েছিল	নদীতে।
৫। জলদেবতা কাঠুরেকে প্রথম যে কুঠারটি দিয়েছিলেন তা ছিল	সততা।
	গুণ।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। সৎ লোকদের কী থাকে না ?

ক. মায়া খ. দয়া
গ. লোভ ঘ. আশা

২। নদীর পাড়ে কী ছিল ?

ক. বন খ. গ্রাম
গ. শহর ঘ. বন্দর

৩। জলদেবতা কাঠুরেকে দ্বিতীয়বার যে কুঠারটি দিয়েছিলেন, সেটি ছিল –

ক. লোহার খ. সোনার
গ. রুপার ঘ. পিতলের

২০১৫

৪। কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা তাকে কয়টি কুঠার দিয়েছিলেন ?

ক. একটি খ. দুটি
গ. তিনটি ঘ. চারটি

৫। 'হ্যাঁ, এটাই আমার কুঠার।' – কথাটি কে বলেছিল ?

ক. চাষি খ. মজুর
গ. কাঠুরে ঘ. কামার

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। সততা কাকে বলে ?
২। সততার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী ?
৩। কাঠুরে কীভাবে সংসার চালাত ?
৪। নদী থেকে কে উঠে এসেছিলেন ?
৫। জলদেবতা কাঠুরের সততায় মুগ্ধ হয়ে কী করেছিলেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। সততার প্রয়োজন কী ?
২। কাঠুরে কীভাবে তার নিজের কুঠার হারিয়েছিল ?
৩। কাঠুরের কুঠার হারানোর পর জলদেবতা কী করেছিলেন ?
৪। 'সততা ধর্মের অঙ্গ' – কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৫। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে থেকে সততা সম্পর্কে একটি ঘটনার বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যবাদিতা

সবসময় সত্যকথা বলার নাম সত্যবাদিতা। যে-কোনো অবস্থায় যে-কারো সামনে সত্যকথা বলতে পারাকেও বলে সত্যবাদিতা। সত্যবাদীরা লাভক্ষতির কথা চিন্তা করে না। জীবন-মৃত্যুর কথা ভাবে না। সত্যই তাদের একমাত্র অবলম্বন। জীবন গেলেও তারা মিথ্যা বলে না। কোনো অবস্থাতেই তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রাচীনকালে এমন একজন সত্যবাদী ছিলেন। তাঁর নাম প্রহ্লাদ। এখানে তাঁর কাহিনী তুলে ধরা হলো।

প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু

দৈত্যদের রাজা হিরণ্যকশিপু। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু দেবতা বিষ্ণুর বিরোধী। কিন্তু প্রহ্লাদ হয়ে উঠলেন অতিশয় বিষ্ণুভক্ত। একথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, 'বিষ্ণু আমার শত্রু। তোমাকে বিষ্ণুনাম ছাড়তে হবে।'

প্রহ্লাদ : তা কী করে সম্ভব, বাবা ? তিনি যে ঈশ্বর !

হিরণ্যকশিপু : বিষ্ণু দৈত্যদের শত্রু। তাই দৈত্যকুলে জন্মে তুমি বিষ্ণুনাম নিতে পারবে না।

প্রহ্লাদ : বাবা, শ্রীবিষ্ণু তো ঈশ্বর। ঈশ্বর কারো শত্রু হন না। তাই আমি তাঁর নাম ছাড়তে পারব না।

হিরণ্যকশিপু আরও রেগে গেলেন। কিন্তু কী করবেন ? ছেলে তো ! তাই তিনি তাকে গুরুমশাইয়ের নিকট পাঠালেন। যদি সংশোধন হয়। কিন্তু কোনো ফল হলো না। প্রহ্লাদ আগের মতোই বিষ্ণুনাম জপতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই ছেলেকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজার আদেশে সেনারা তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করল। কিন্তু তাতে প্রহ্লাদ মরলেন না। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আগুন নিভে গেল। গায়ে পাথর বেঁধে নদীতে ফেলা হলো। পাথর ভেসে উঠল। হাতির পায়ের নিচে ফেলা হলো। হাতি শুঁড় দিয়ে তাঁকে পিঠে তুলে নিল। তাঁকে সাপের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সাপ ফণা তুলে তাঁর চারদিকে নাচতে লাগল। বিষ মাখানো খাবার খাওয়ানো হলো। তাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হলো না।

তারপর একদিন হিরণ্যকশিপু সিংহাসনে বসে আছেন। ক্রোধে তাঁর চোখ লাল। তিনি

প্রহ্লাদকে ডাকলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুনাম জপতে জপতে পিতার কাছে এলেন। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে হুংকার দিয়ে বললেন, 'আমি নিজের হাতে তোমাকে মারব। দেখি কে তোমায় বাঁচায় !'

প্রহ্লাদ : বিষ্ণুই আমাকে বাঁচাবেন।

হিরণ্যকশিপু : এখানে এসে বাঁচাবেন?

প্রহ্লাদ : তিনি তো সর্বত্রই আছেন, বাবা।

হিরণ্যকশিপু : সর্বত্র ! এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও ?

প্রহ্লাদ : অবশ্যই, বাবা।

হিরণ্যকশিপু তখন হুংকার দিয়ে স্ফটিক স্তম্ভটি ভেঙে ফেললেন। আর তখনই তার মধ্য থেকে বের হয়ে এলেন এক ভয়ংকর মূর্তি। তাঁর নাম নৃসিংহ। তাঁর মুখটা সিংহের মতো। আর শরীরটা 'নৃ' অর্থাৎ মানুষের মতো। বের হয়েই হিরণ্যকশিপুকে দুই উরুর উপর রেখে হত্যা করলেন। প্রহ্লাদ করজোড়ে নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

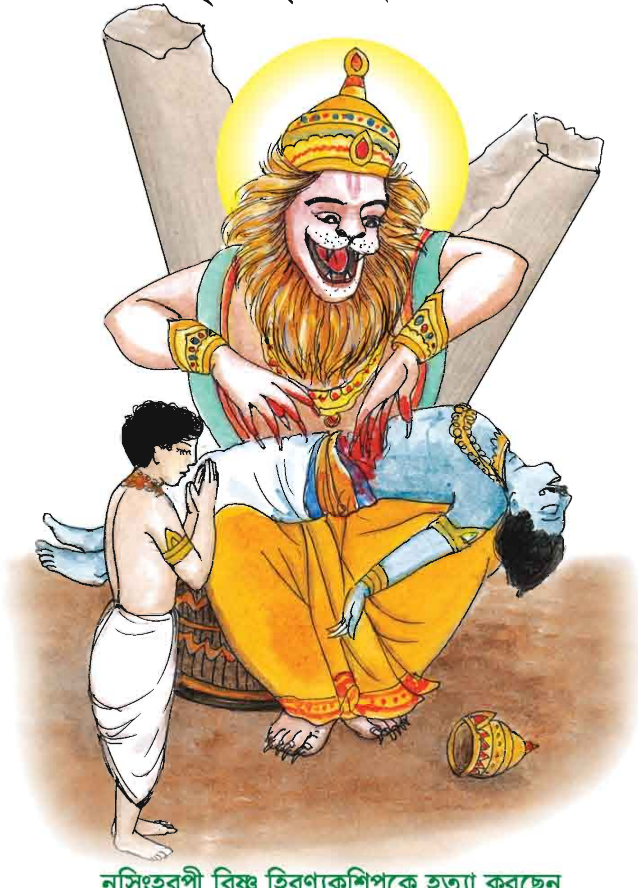

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করছেন

নিচের ছকটি পূরণ করি :	
১। সবসময় সত্যকথা বলার নাম	
২। প্রহ্লাদ যার নাম করতেন	
৩। স্তম্ভ কথাটির অর্থ	
৪। বিষ্ণুর সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সম্পর্ক ছিল	

'প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু' গল্পের নৈতিক শিক্ষা হলো : যে-কোনো অবস্থায় সত্যকথা বলতে হবে। সত্য বলতে ভয় পাওয়া চলবে না। সত্যবাদী মৃত্যুকে ভয় পায় না। তার জীবনে অনেক বিপদ আসতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। তাই আমাদের সত্যবাদী হতে হবে।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রহ্লাদ ছিলেন একজন ______।

২। সত্যবাদী ______ চিন্তা করে না।

৩। সৎ ব্যক্তিরা জীবন গেলেও ______ বলে না।

৪। ঈশ্বর কারো ______ হন না।

৫। প্রহ্লাদ বলেছিলেন, ______ আমাকে বাঁচাবেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। সত্যবাদিতাও	বিষ্ণুভক্ত।
২। প্রহ্লাদ হয়ে উঠেছিলেন একজন	মৃত্যুকে।
৩। প্রহ্লাদ জন্মেছিলেন	ধর্ম ।
৪। প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল	আগুনে।
৫। সত্যবাদী ভয় পায় না	হত্যা।
	দৈত্যকুলে।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। প্রহ্লাদের পিতার নাম কী?

ক. হিরণ্যাক্ষ   খ. হিরন্ময়
গ. হিরণ্যকশিপু   ঘ. হিরণ্যপতি

২। প্রহ্লাদ কার নাম জপ করত?

ক. বিষ্ণুনাম   খ. কৃষ্ণনাম
গ. শিবনাম   ঘ. দুর্গানাম

৩। প্রহ্লাদকে কিসের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

ক. বাঘের ঘরে   খ. সিংহের ঘরে
গ. সাপের ঘরে   ঘ. ভল্লুকের ঘরে

৪। অনেক কষ্ট পেয়েও প্রহ্লাদ কী ত্যাগ করেন নি?

ক. বিষ্ণুভক্তি   খ. রাজত্ব
গ. ক্ষমতা   ঘ. টাকা-পয়সা

৫। প্রহ্লাদের অনুসরণ করে আমরা হব–

ক. ধনী   খ. জ্ঞানী
গ. সাধক   ঘ. সত্যবাদী

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। সত্যবাদিতা কাকে বলে?
২। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কেন?
৩। প্রহ্লাদকে হাতির পায়ের নিচে ফেলে দেওয়ার পর হাতি কী করেছিল?
৪। প্রহ্লাদের জীবন অনুসরণ করে আমরা কী হতে পারব?
৫। বিষ্ণু কোনরূপে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। সত্যবাদিতা বলতে কী বোঝায়? বুঝিয়ে লেখ।
২। সত্যবাদিতার উপকারিতা কী?
৩। আমরা সত্যবাদী হব কেনো?
৪। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু কীভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন?
২০২৫ ৫। প্রহ্লাদের সত্যবাদিতার গল্পটি থেকে কী নৈতিক শিক্ষা পেলে?

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

স্বাস্থ্যরক্ষা

শরীর সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যরক্ষা বলতে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা বোঝায়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশ কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। ব্যায়াম করতে হয়। ঠিক সময় ঘুমাতে হয়। ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হয়। সাবান দিয়ে স্নান করতে হয়। এভাবে চললে শরীর সুস্থ থাকে।

শরীর সুস্থ থাকলে মনও ভালো থাকে। কারণ শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শরীর ও মন সুস্থ থাকলে যে-কোনো কাজে সফল হওয়া যায়। শরীর অসুস্থ থাকলে কোনো কাজে মন বসে না। ফলে সফলতাও আসে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মেরও একটা সম্পর্ক আছে। ধর্মের কথা ভাবতে গেলে মন ভালো থাকতে হবে। ধর্মচর্চার জন্য মনের স্থিরতা প্রয়োজন। একমনে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনের এই স্থিরতার জন্য শরীর সুস্থ থাকা চাই। তাই ধর্মচর্চার জন্যও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন আছে।

অতএব, এখান থেকে আমরা শিখলাম যে, স্বাস্থ্যরক্ষা অবশ্য কর্তব্য। আরও শিখলাম কীভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে হয়। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কাজে সফলতা আসে না। ধর্মচর্চার জন্যও স্বাস্থ্য রক্ষা করা প্রয়োজন।

দুটি শিশু ব্যায়াম করছে

আসন

যোগব্যায়ামের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় আসন। আসনের ফলে শরীর সুস্থ থাকে। কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা বিভিন্ন আসন করতেন। এতে তাঁদের শরীর সুস্থ থাকত। ফলে তাঁরা মনোযোগ দিয়ে উপাসনা করতে পারতেন। ধর্মচর্চা করতে পারতেন। ঈশ্বরের ধ্যান করতে পারতেন। বর্তমানে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন আসন করে শরীর সুস্থ রাখার জন্য। নিম্নে সুখাসন, পদ্মাসন ও শবাসন-এর বর্ণনা করা হলো।

সুখাসন

সুখাসন

সুখাসন করার সময় দুই পা ভেঙে সোজা হয়ে বসতে হবে। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা ভেঙে বসতে হবে। বাম হাতের তালুতে ডান হাত চিৎ করা অবস্থায় কোলের উপর রাখতে হবে। এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকার পর বিপরীতক্রমে বসতে হবে। সুখাসনের আরেক নাম বীরাসন। এতে বাত ইত্যাদি রোগ ভালো হয়। মনের একাগ্রতা বাড়ে। দীর্ঘজীবন লাভ হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এ আসনটি জরুরি।

পদ্মাসন

পদ্মাসন

এ আসনও সুখাসনের মতো। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা ভেঙে বসতে হবে। এতে পা-দুটি পদ্মের মতো দেখায়। তাই এর নাম পদ্মাসন। পদ্মাসনে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত চিৎ করা অবস্থায় কোলের উপর রাখতে হবে। এভাবে ৩০ সেকেন্ড থাকার পর বিপরীতক্রমে বসতে হয়। এ আসনের ফল সুখাসনের মতোই। বাত ইত্যাদি রোগ সারে। মনের একাগ্রতা বাড়ে। দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

শবাসন

এই আসনে শব অর্থাৎ মড়ার মতো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তাই এর নাম শবাসন। শবাসনে পা-দুটি একটু ফাঁক করে রাখতে হয়। নিয়মমতো দম নিতে হয় ও ছাড়তে হয়। শরীরটাকে একেবারে শিথিল করে দিতে হয়। যে-কোনো আসন করার পরই শবাসন করে ক্লান্তি দূর করা হয়। কমপক্ষে এক মিনিট ধরে শবাসন করতে হয়। অনেকে ক্লান্তি দূর করার জন্য ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত শবাসনে থাকেন। এ আসন করলে ক্লান্তি দূর হবে। নতুন কর্মশক্তি পাওয়া যাবে। আমরা এ আসনটি করলে অধিক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারব। তাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটবে না।

শবাসন

নিচের ছকটি পূরণ করি :

তিনটি আসনের নাম
১।
২।
৩।
পদ্মাসনের দুইটি উপকারিতা
১।
২।

আমরা জানলাম, বিভিন্ন আসন অনুশীলন করলে শরীর সুস্থ থাকবে। মনের একাগ্রতা বাড়বে। ফলে আমরা পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারব। তাই স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে আসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শরীরের সঙ্গে ______ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।
২। স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ______ সম্পর্ক আছে।
৩। ধর্মচর্চার জন্য মনের ______ প্রয়োজন।
৪। যোগব্যায়ামের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় ______।
৫। আসন করলে মনের ______ বাড়ে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য	মন ভালো থাকে।
২। শরীর সুস্থ থাকলে	সুস্থ থাকে।
৩। একমনে ডাকতে হয়	ব্যায়াম করতে হয়।
৪। আসনের ফলে শরীর	ঈশ্বরকে।
৫। শবাসনে পা-দুটি একটু	পূজা করতে হয়।
	ফাঁক করে রাখতে হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শরীর সুস্থ থাকার নাম কী ?

ক. দীর্ঘজীবন খ. আনন্দ
গ. স্বাস্থ্য ঘ. ব্যায়াম

২। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কী করতে হয় ?

ক. ব্যায়াম করতে হয় খ. বেশি করে খেতে হয়
গ. বেড়াতে যেতে হয় ঘ. বেশি করে ঘুমাতে হয়

৩। কোন আসন করার সময় মড়ার মতো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হয় ?

ক. সুখাসন খ. পদ্মাসন
গ. হলাসন ঘ. শবাসন

৪। সুখাসনের আর এক নাম কী ?

ক. বীরাসন খ. পদ্মাসন

গ. চক্রাসন ঘ. শবাসন

৫। সুখাসনে একভাবে কতো সময় থাকতে হয় ?

ক. ১০ সেকেন্ড খ. ২০ সেকেন্ড

গ. ৩০ সেকেন্ড ঘ. ৪০ সেকেন্ড

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায় ?

২। ধর্মচর্চার জন্য কী প্রয়োজন ?

৩। আসন কাকে বলে ?

৪। আসন করলে কী হয় ?

৫। পদ্মাসনের এরূপ নাম হলো কেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কী কী নিয়ম পালন করা উচিত ?

২। শরীরের সুস্থতার সঙ্গে মনের সম্পর্ক কী ?

৩। আসন কাকে বলে বুঝিয়ে লেখ।

৪। আসন ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক কী ?

৫। সুখাসনের বর্ণনা দাও।

অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

মানুষের মধ্যে যে-সকল মহৎ গুণ রয়েছে, দেশপ্রেম সেগুলোর অন্যতম। দেশের প্রতি ভালোবাসাকে বলে দেশপ্রেম। পাখি যেমন ভালোবাসে আপন নীড়কে, পশু যেমন ভালোবাসে নিজের বাসস্থানকে, মানুষও তেমনি ভালোবাসে নিজের দেশকে। স্বদেশের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায়? দেশকে ভালোবাসা, দেশের মঙ্গল করা, দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এসব কাজের মধ্য দিয়েই দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে – 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' অর্থাৎ জননী-জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। প্রতিটি সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য তাঁরা হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে দেশের ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছেন।

দেশপ্রেম নিজের দেশকে জানতে শেখায়, দেশকে ভালোবাসতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায় দেশের মানুষকে। দেশপ্রেম পবিত্র। দেশপ্রেম মানুষের জীবনের অন্যতম মহৎ চেতনা। দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ ত্যাগ করেন তাঁরা সকলের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়। তাঁরা স্বর্গ লাভ করে থাকেন। প্রাচীনকালে অনেকে দেশপ্রেমের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। মহাভারত থেকে এমনি একজন দেশপ্রেমিক রানির কাহিনী জানব।

জনার দেশপ্রেম

প্রাচীনকালে মাহিষ্মতী নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল নীলধ্বজ। রানির নাম ছিল জনা। নীলধ্বজ ও জনার একটি মাত্র পুত্র ছিল। তাঁর নাম প্রবীর। রাজপুত্র প্রবীর ছিলেন খুবই সাহসী।

পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য অশ্ব ছেড়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছে রাজাদের যজ্ঞ। এ যজ্ঞের নিয়ম হচ্ছে রাজা একটি অশ্ব ছেড়ে দেবেন। অশ্বের পিছনে থাকবে সৈন্য-সামন্ত। অশ্ব চলে যাবে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে। পরাজিত রাজা হবেন জয়ী

রাজার অধীন। এভাবে সকল রাজাকে পরাজিত করতে হবে। আর অশ্ব বাধাগ্রস্ত না হলে অন্য রাজ্যে চলে যাবে। যজ্ঞের অশ্বকে বাধা না দেওয়ার অর্থ পরাধীনতা মেনে নেওয়া। সবশেষে অশ্বকে ফিরিয়ে এনে তাকে বলি দিয়ে যজ্ঞ শেষ করতে হবে। এরই নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজা হবেন রাজার রাজা।

পাণ্ডবদের ছেড়ে দেওয়া যজ্ঞের অশ্ব গেল মাহিষ্মতী রাজ্যে। রাজপুত্র প্রবীর অশ্বটিকে বাধা দিলেন এবং আটকে রাখলেন। রাজা নীলধ্বজ খুব ভয় পেলেন। তিনি অশ্বটিকে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু বাধা দিলেন স্বাধীনচেতা রানি জনা। তিনি প্রবীরকে সমর্থন করলেন। কেননা রানি জনা পরাধীনতা মেনে নিতে চান নি।

প্রবীরের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো পাণ্ডবসেনাপতি অর্জুনের। যুদ্ধে প্রবীর হেরে গেলেন এবং অর্জুনের হাতে নিহত হলেন। পুত্রশোকে কাতর হলেন রানি জনা। কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। কেননা জনা দেশপ্রেমিক। তাঁর পুত্র প্রবীরও দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু গৌরবের।

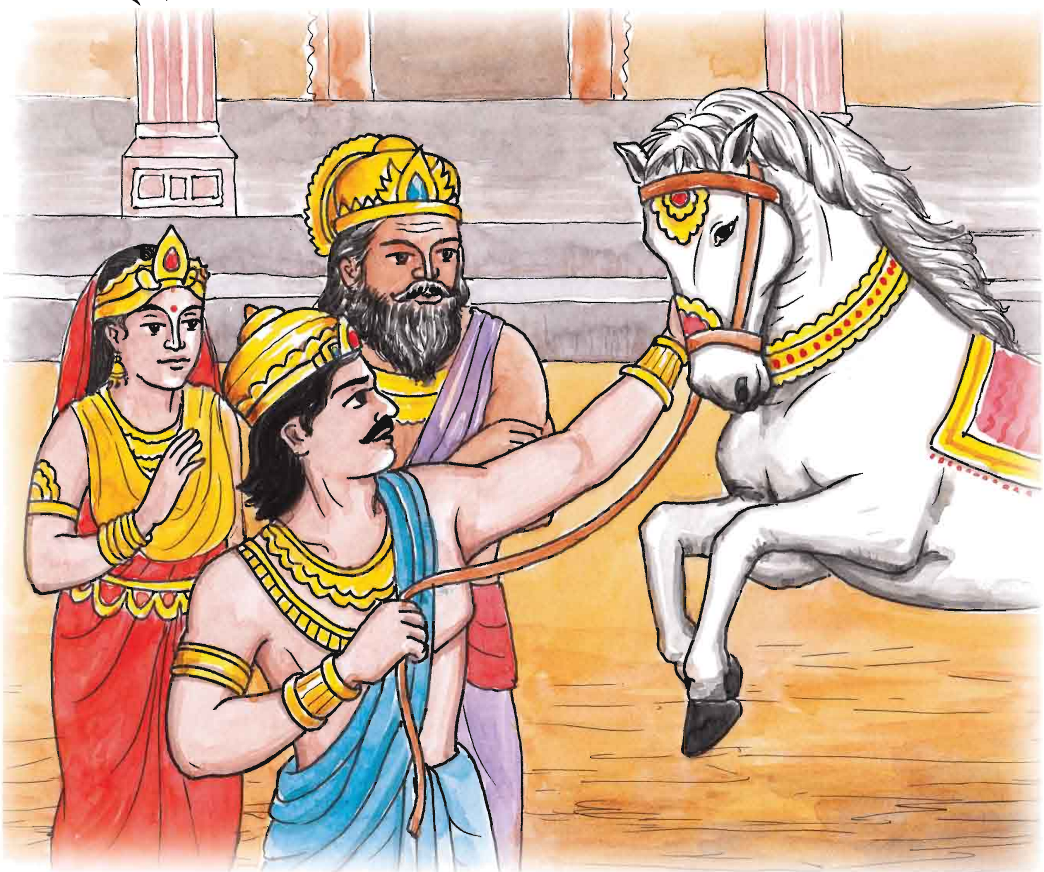

যজ্ঞের অশ্ব বেঁধে রাখা হয়েছে। পাশে রাজা নীলধ্বজ, রানি জনা এবং রাজপুত্র প্রবীর

কিন্তু রাজা নীলধ্বজ পরাজয় মেনে নিলেন। ছেড়ে দিলেন পাণ্ডবদের যজ্ঞের অশ্ব। এতে রানি জনা খুব দুঃখ পেলেন। পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। তাই গঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন জনা। দেশপ্রেমের জন্য তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন। ধন্য জনা, ধন্য বীরমাতার বীরপুত্র প্রবীর।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। প্রবীর অশ্বমেধের ঘোড়া	
২। প্রবীর প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিলেন কার সঙ্গে	

আমরাও জনা ও প্রবীরের মতো দেশপ্রেমিক হব। ভালোবাসব আমাদের দেশকে। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাজ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। পাখি ______ ভালোবাসে।
২। মানুষ ভালোবাসে ______ ।
৩। দেশের প্রতি অনুরাগকে বলে ______ ।
৪। জননী ______ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
৫। পরাধীনতার চেয়ে ______ ভালো।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা	ভীরু।
২। দেশপ্রেম মানুষের	মহৎ গুণ।
৩। বীরমাতার	সকলের দায়িত্ব।
৪। ভালোবাসব	বীরপুত্র।
৫। প্রবীর ছিলেন	আমাদের দেশকে।
	খুবই সাহসী।

২০১৬

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। দেশপ্রেমিক জনার কাহিনী কোথায় আছে ?

ক. রামায়ণে খ. মহাভারতে
গ. চণ্ডীতে ঘ. পুরাণে

২। মাহিষ্মতী রাজ্যের রাজার নাম কী ?

ক. যুধিষ্ঠির খ. রাম
গ. নীলধ্বজ ঘ. নল

৩। জনার পুত্রের নাম কী ?

ক. প্রবীর খ. মহাবীর
গ. আবীর ঘ. সুবীর

৪। অশ্বমেধ যজ্ঞ কারা করেন ?

ক. ঋষিরা খ. প্রজারা
গ. দেবতারা ঘ. রাজারা

৫। পাণ্ডবসেনাপতি কে ?

ক. ভীম খ. নকুল
গ. অর্জুন ঘ. শ্রীকৃষ্ণ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম বলতে কী বোঝায় ?
২। দেশপ্রেম আমাদের কী শেখায় ?
৩। দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ কেনো?
৪। দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা কী ?
৫। আমরা দেশকে ভালোবাসব কেনো?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায় ?
২। যে-কোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘটনা বর্ণনা কর।
৩। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৪। দেশপ্রেমিক জনার কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৫। পাঠ্যবহির্ভূত দেশপ্রেমমূলক কোনো ঘটনা বা গল্প সংক্ষেপে লেখ।

নবম অধ্যায়

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। মন্দিরে পূজা-অর্চনা হয়। সুতরাং যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির বলে।

দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন – শিব মন্দির, কালী মন্দির, দুর্গা মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। শিব মন্দিরে থাকে শিবের মূর্তি। কালী মন্দিরে থাকে কালীর মূর্তি। দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি। কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে কৃষ্ণের মূর্তি। এভাবে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। স্থানের নাম অনুসারেও মন্দিরের নামকরণ হয়ে থাকে, যেমন- ঢাকেশ্বরী, ইত্যাদি।

মন্দির পবিত্র ও পুণ্য স্থান। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে দেব-দেবী দর্শন করতে যান। মন্দিরে গিয়ে পূজা-অর্চনা করেন। মন্দিরে দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন। দেবদর্শনে মনে ভক্তি আসে, মনে ধর্মীয় ভাবের উদয় হয়। তাই সকলেরই মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করতে হবে। পূজা-অর্চনা করতে হবে।

নানা স্থানে বড় বড় মন্দির আছে। যেমন – ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির। দিনাজপুরে কান্তজি মন্দির। কোলকাতার কালীঘাটে কালী মন্দির। পুরীতে জগন্নাথ মন্দির।

এখানে ঢাকেশ্বরী মন্দির ও কান্তজি মন্দিরের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন ও জাতীয় মন্দির। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে দুর্গামূর্তি। এখানে প্রতিদিন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় দেবীর পূজা-অর্চনা হয়। মন্দিরের পাশে কয়েকটি শিব মন্দির আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। প্রতিবছর এখানে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে আসেন।

ঢাকেশ্বরী মন্দির

কান্তজি মন্দির

দিনাজপুরে কান্তজি মন্দির অবস্থিত। মহারাজ প্রাণনাথ এ মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তাঁর পুত্র রামনাথ ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মহারাজ রামনাথ ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে রুক্মিণীকান্ত বা কান্তজি নামে মন্দিরটি উৎসর্গ করেন। রুক্মিণীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম।

এ মন্দিরে কান্তজি বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। মন্দিরটি খুবই আকর্ষণীয়। মন্দিরের দেয়ালে অনেক পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র রয়েছে। যেমন – রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি। দেয়ালে কৃষ্ণলীলার অনেক চিত্রও আছে। এ-সকল চিত্র পোড়ামাটির ফলকে

২০২৫

কান্তজি মন্দির

অঙ্কিত। পোড়ামাটির ফলকে অঙ্কিত এ ধরনের চিত্রকে টেরাকোটা বলে। এসব টেরাকোটা শিল্পকর্মের জন্য মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। এ মন্দিরে প্রতিদিন পূজা-অর্চনা হয়।

তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো পুণ্য স্থান। দেবতা বা মুনি-ঋষির নামে তীর্থক্ষেত্রের নামকরণ করা হয়। তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে শ্রদ্ধা জানালে দেব-দেবী ও মুনি-ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মীয় ভাবের উদয় হয়। মনে পাপ থাকে না। পুণ্যলাভ হয়। মনে শান্তি আসে। সুতরাং যে পুণ্য স্থানে গেলে পাপ থাকে না ও পুণ্যলাভ হয় তাকে তীর্থক্ষেত্র বলে। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য মানুষ তীর্থক্ষেত্রে যায়। ধর্মকর্মের জন্য

তীর্থ উত্তম স্থান। তীর্থের ফল অনেক। তীর্থে স্নান করলে ও রাত্রি যাপন করলে মন পবিত্র হয়। আর পবিত্র মানুষ কোনো মন্দ কাজ করতে পারেন না। তীর্থের গুণে স্বর্গ লাভ হয়।

অনেক জায়গায় তীর্থক্ষেত্র আছে। চন্দ্রনাথ, লাঙলবন্দ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

এখানে লাঙলবন্দ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা দেওয়া হলো।

লাঙলবন্দ

বাংলাদেশের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র লাঙলবন্দ। নারায়ণগঞ্জ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে লাঙলবন্দ অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। প্রাচীনকালে পরশুরাম এ তীর্থে স্নান করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন। চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান অনুষ্ঠিত হয়। লাঙলবন্দের স্নানকে বলে অষ্টমী স্নান। এখানে স্নান করলে মানুষ পাপমুক্ত হয়। লাঙলবন্দে স্নানের জন্য দেশ-বিদেশের অনেক লোক আসে।

লাঙলবন্দ তীর্থে স্নানের দৃশ্য

লাঙলবন্দে অনেক মন্দির আছে। প্রতিদিন মন্দিরগুলোতে পূজা-অর্চনা হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। কান্তজি মন্দির কোথায়?	
২। লাঙলবন্দ একটি	
৩। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে	

তীর্থক্ষেত্রের জল-মাটি সবই পবিত্র। তীর্থক্ষেত্রে স্নান করলে পাপ দূর হয়। এ কারণে আমরা মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে তাকে ______ বলে।
২। মন্দিরে ______ পূজা-অর্চনা হয় ।
৩। ঢাকেশ্বরী মন্দির ______ অবস্থিত।
৪। মন্দির হলো ______ ।
৫। তীর্থে গেলে আমাদের মন ______ হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্দির হলো →	লাঙলবন্দ।
২। দেবতাদের নামানুসারে	দেবালয়।
৩। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আছে	পবিত্র স্থান।
৪। বাংলাদেশের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র	মন্দিরের নাম হয়।
৫। তীর্থক্ষেত্রে স্নান করলে	দুর্গামূর্তি।
	পাপ দূর হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। কালী মন্দিরে থাকে –

ক. কৃষ্ণের মূর্তি   খ. গণেশের মূর্তি
গ. কালীর মূর্তি   ঘ. দুর্গার মূর্তি

২। শিব মন্দিরে থাকে –

ক. কৃষ্ণের মূর্তি   খ. শিবের মূর্তি
গ. দুর্গার মূর্তি   ঘ. কালীর মূর্তি

৩। ঢাকেশ্বরী মন্দির কাদের তীর্থক্ষেত্র ?

ক. হিন্দুদের   খ. মুসলমানদের
গ. খ্রিষ্টানদের   ঘ. বৌদ্ধদের

৪। কান্তজি মন্দিরে বিগ্রহ আছে –

ক. রামের   খ. শিবের
গ. শ্রীকৃষ্ণের   ঘ. কালীর

৫। লাঙলবন্দ কোথায় অবস্থিত ?

ক. যমুনার তীরে   খ. মেঘনার তীরে
গ. পদ্মার তীরে   ঘ. ব্রহ্মপুত্রের তীরে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মন্দিরকে দেবালয় বলা হয় কেন ?
২। ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে কী করেন ?
৩। কান্তজি মন্দির কোথায় অবস্থিত ?
৪। তীর্থক্ষেত্র কাকে বলে ?
৫। বাংলাদেশের দুটি তীর্থক্ষেত্রের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মন্দির কাকে বলে ? আমরা মন্দিরে গিয়ে কী করি ?
২। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বর্ণনা দাও।
৩। কান্তজি মন্দিরের বর্ণনা দাও।
৪। লাঙলবন্দ তীর্থক্ষেত্রের বর্ণনা দাও।
৫। লাঙলবন্দে গিয়ে ভক্তগণ কী উপায়ে শ্রদ্ধা জানান ?

সমাপ্ত

২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য,৩য়-হিন্দুধর্ম

কারো মনে কষ্ট দিও না

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য